পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

প্রমাণ ও মুজিজার বিশ্বকোষ

মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ

বৈজ্ঞানিক মুজিজা · ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য · সত্য হয়ে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী

তাওরাত ও ইনজিলের সুসংবাদ · জিন, জাদু ও অদৃশ্যের জগৎ

শিশুও বুঝতে পারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা · 157টি রঙিন চিত্র

157টি প্রমাণ, শক্তি অনুসারে সাজানো

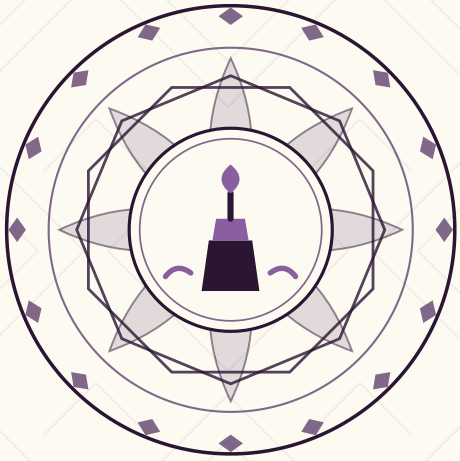

পঞ্চম পর্ব

জিন, জাদু ও গায়েবের জগৎ

একটি বাস্তব জগৎ, যার খবর আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, প্রতিটি জাতির ইতিহাস যার সাক্ষ্য দেয়, আর যার প্রমাণিত ঘটনাগুলো ঘটেছে নবি ﷺ-এর সঙ্গে, তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে, এবং আমাদের এ যুগ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গেও।

18 প্রমাণ

128 জিনদের একটি দল কুরআন শুনেছিল

বলুন, আমার কাছে ওহি পাঠানো হয়েছে যে জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে শুনেছে, অতঃপর তারা বলেছে, আমরা এক আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথের দিশা দেয়, তাই আমরা তাতে ঈমান এনেছি।

সূরা জিন — আয়াত 1-2

জিন এমন এক সৃষ্টি যারা আদেশ-নিষেধের অধীন: তাদের মধ্যে মুসলিমও আছে, কাফিরও আছে

সহজ কথায়

জিন বাস্তব এক সৃষ্টি, আল্লাহ তাদের আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাদের দেখি না, তারা আমাদের দেখে। আর কুরআনে **তাদের নামেই একটি পূর্ণ সূরা** রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে তাদের একটি দল কুরআন শুনে তাতে ঈমান এনেছিল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরবরা জিনদের চিনত এবং তাদের ভয় করত; বরং তাদের কেউ কেউ **জিনের আশ্রয় চাইত**, তাদের পূজা করত এবং সফরে তাদের কাছে নিরাপত্তা চাইত — এ কথা সূরাটি নিজেই উল্লেখ করেছে: "আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক জিনের মধ্যে কিছু লোকের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছিল।" তারা জিনের প্রতি গায়েবের জ্ঞান আরোপ করত এবং তাদের কাছ থেকেই গণকবিদ্যা নিত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ইসলাম **তাদের অস্তিত্ব অস্বীকারও করেনি, বাড়িয়েও বলেনি** — বরং বিষয়টিকে নিখুঁতভাবে সীমাবদ্ধ করেছে: তাদের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করেছে এমন এক দায়বদ্ধ সৃষ্টি হিসেবে যাদের মধ্যে সৎ ও অসৎ দুই-ই আছে; গায়েবের জ্ঞান তাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে ("আর আমরা ধারণা করতাম, মানুষ ও জিন আল্লাহর প্রতি কখনো মিথ্যা বলবে না", এবং "আর আমরা জানি না, পৃথিবীতে যারা আছে তাদের ব্যাপারে অমঙ্গল চাওয়া হয়েছে কি না"); **তাদের কাছে আশ্রয় চাওয়া হারাম করেছে** এবং তাকে শিরক গণ্য করেছে; আর গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। এভাবে সত্যটুকু রেখে দিয়েছে, আর কুসংস্কার ও দাসত্ব দুটোই সরিয়ে দিয়েছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি **এমন এক ভারসাম্য যার তুলনা আশপাশে নেই**। ধর্ম ও সংস্কৃতিগুলো হয় আত্মার জগৎকে এতটা ফুলিয়ে তোলে যে তা জ্ঞান ও শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়, যাকে পূজা করতে হয় ও সন্তুষ্ট রাখতে হয়; নয়তো তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে কুসংস্কার বানিয়ে দেয়। কুরআন তৃতীয় একটি পথ নিয়েছে: **অস্তিত্ব সাব্যস্ত করেছে, উপাসনা বাতিল করেছে, আর গায়েবের জ্ঞান অস্বীকার করেছে**। এই কিতাব যদি ওই পরিবেশের কোনো মানুষের রচনা হতো, তবে তার পক্ষে সহজ ছিল লোকে যা মেনে নিয়েছে তাতেই সায় দেওয়া আর তা নিজের কর্তৃত্বে কাজে লাগানো — তার আগের গণকরা যেমন করত। কিন্তু তা বরং গণকবিদ্যার গোটা ব্যবসাটিই ভেঙে দিল, যা ছিল উপদ্বীপের সবচেয়ে লাভজনক পেশাগুলোর একটি।

129 ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির মতো শুকনো মাটি থেকে, আর জিনকে ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে।

সূরা আর-রহমান — আয়াত 14-15

মানুষ: মাটি আর পানি

জিন: ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা

"মারিজ" = বিশুদ্ধ, অস্থির শিখা, যাতে কোনো ধোঁয়া নেই

দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদান — আর এ কারণেই একে অপরকে দেখতে পায় না

সহজ কথায়

আমরা **মাটি** থেকে সৃষ্ট, আর জিন সৃষ্ট **বিশুদ্ধ, অস্থির আগুন** থেকে, যাতে কোনো ধোঁয়া নেই। আর উপাদান ভিন্ন বলেই আপনার চোখ তাদের ধরতে পারে না — অথচ তারা আপনাকে দেখে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জিন নিয়ে মানুষের ধারণা ছিল নিয়ন্ত্রণহীন লোককল্পনা: ভূত, প্রেত আর ভয়ংকর সব আকৃতি। তাদের সৃষ্টির উপাদান কী, তার কোনো সংজ্ঞা ছিল না; কেন তাদের দেখা যায় না, তারও কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। আর এখানে যে আরবি শব্দটি এসেছে, তা এক সূক্ষ্ম পারিভাষিক শব্দ, যার ব্যবহার খুবই কম।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আরবি অভিধানে **মারিজ** হলো সেই বিশুদ্ধ, মিশ্রিত, অস্থির শিখা যাতে কোনো ধোঁয়া নেই। এটি শক্তির একটি বিশেষ রূপের বর্ণনা, কোনো ঘন বস্তুপিণ্ডের নয়। আর বিজ্ঞান আজ বলে, **মানুষের চোখ যা দেখে তা তড়িৎ-চৌম্বক বর্ণালির অতি সামান্য একটি অংশমাত্র** (প্রায় 400-700 ন্যানোমিটার), আর মহাবিশ্বের বস্তু ও শক্তির প্রায় 95% "অন্ধকার", যা দেখা যায় না, কেবল তার প্রভাব দিয়েই শনাক্ত করা যায়। কাজেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের নাগালের বাইরে কোনো জগৎ থাকা আজকের বৈজ্ঞানিক মনের কাছে অদ্ভুত কিছু নয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

কুরআন তাদের না-দেখা যাওয়ার কারণ স্পষ্ট করে বলেছে, আর তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম: "**নিশ্চয়ই সে ও তার দলবল আপনাদের দেখে এমন জায়গা থেকে, যেখান থেকে আপনারা তাদের দেখেন না।**" দেখাটা চলে এক দিকে, দুই দিকে নয় — আর এর জন্য দরকার **উপলব্ধির প্রকৃতিতেই** পার্থক্য, নিছক লুকিয়ে থাকা বা আড়াল নেওয়া নয়। এরপর সৃষ্টির দুই উপাদানের পার্থক্য সামর্থ্যের পার্থক্যটিও ব্যাখ্যা করে: দ্রুততা, ভেদ করে যাওয়া আর আকৃতি বদলানো। এটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত **অভ্যন্তরীণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ** একটি ব্যাখ্যা, জাতিগুলোর পুরাণের মতো ছড়ানো-ছিটানো কিছু চিত্র নয়।

130 জাদু স্বয়ং নবী ﷺ-এর উপরেই হয়েছিল

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর জাদু করা হয়েছিল, এমনকি তাঁর মনে হতো তিনি কোনো কাজ করেছেন, অথচ তা করেননি ... একটি চিরুনি, চিরুনিতে ওঠা চুল আর খেজুরের পুরুষ মোচার খোলে, আর তা ছিল যারওয়ান কূপে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

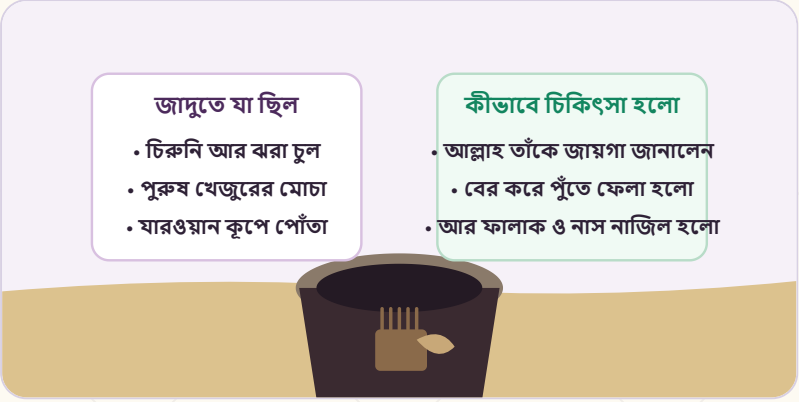

মদিনার যারওয়ান কূপ — যেখান থেকে জাদু বের করা হয়েছিল

সহজ কথায়

জাদু বাস্তব একটি জিনিস, যার প্রভাব আছে; কল্পনা বা ভ্রম নয়। এর সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ হলো, **তা স্বয়ং নবী ﷺ-এর উপরেই ঘটেছিল** — তাঁর মনে হতো তিনি কোনো কাজ করেছেন, অথচ করেননি; শেষে আল্লাহ তাঁকে তার জায়গা জানিয়ে দিলেন আর তা বের করা হলো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জাদু ছিল এ অঞ্চলের প্রতিটি সভ্যতায় পরিচিত ও রমরমা একটি পেশা: বাবিল, মিসর, ইয়েমেন আর আরব উপদ্বীপ। জাদুকর ছিল মর্যাদা, সম্পদ আর প্রভাবের অধিকারী। আর নবী ﷺ-এর পক্ষে তাঁর উপর যা ঘটেছিল তা গোপন করা সহজই ছিল — কারণ কোনো মানুষের দাওয়াতের জন্য এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর নেই যে বলা হবে, জাদু তাঁকে কাবু করেছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে** আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, খুঁটিনাটি সবিস্তারে: জাদুকরের নাম (লাবিদ ইবনুল আসাম), জাদুর উপকরণ (চিরুনি, চুল আর খেজুরের মোচার খোল), তার জায়গা (যারওয়ান কূপ), তার প্রভাবের বিবরণ, আর কীভাবে তা বের করা হলো। **আহলুস সুন্নাহ একমত যে জাদুর বাস্তবতা ও প্রভাব আছে**, আর সেই প্রভাব ওহি বা রিসালাত পৌঁছে দেওয়াকে স্পর্শ করেনি — কেবল তাঁর ব্যক্তিগত দুনিয়াবি বিষয়গুলোতেই সীমিত ছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, যা আলিমগণ স্পষ্ট করে বলেছেন, কারণ বাণী পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সুরক্ষা অটুট।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানকার প্রমাণটি বিরল ধরনের: **এমন একটি বর্ণনা যার বাহ্যিক অর্থ দাওয়াতের বাহকেরই ক্ষতি করে, তবু তা বর্ণিত ও সংরক্ষিত হয়েছে**। নবী ﷺ তা গোপন করেননি, তাঁর সাহাবিগণ তা চেপে যাননি, হাদিসবিদগণ তা বাদ দেননি — বরং মুসলিমদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ দুই কিতাব তা লিপিবদ্ধ করেছে। আর যে ব্যক্তি ধর্ম বানায়, সে নিজের সম্পর্কে এ কথা বর্ণনা করে না যে এক ইহুদির জাদু তাকে কাবু করেছিল। ঐতিহাসিক সমালোচকরা একে বলেন **বিব্রতকরতার মানদণ্ড**: যে বর্ণনা বর্ণনাকারীর ক্ষতি করে, তা তার উপকার করা বর্ণনার চেয়ে সত্যের বেশি কাছাকাছি। আর ঘটনাটি স্থায়ী একটি ফলও দিয়েছে: **আশ্রয়ের দুই সূরা**, যা আজ পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিমের হাতে-কলমে প্রতিকার।

১৩১ আশ্রয়ের দুই সূরা — প্রত্যেক মুসলিমের দুর্গ

> বলুন, আমি আশ্রয় নিচ্ছি ভোরের প্রতিপালকের কাছে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে ... আর গিঁটে ফুঁ দেওয়া নারীদের অনিষ্ট থেকে, আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।
>
> **সূরা ফালাক — আয়াত 1-5**

দুটি সূরা, যা নাজিল হয়েছে জাদু আর হিংসার অনিষ্ট থেকে মানুষকে রক্ষা করতে

সহজ কথায়

যখন জাদু ঘটল, তখন মানুষকে প্রতিকারহীন রাখা হয়নি। দুটি ছোট সূরা নাজিল হলো — **ফালাক আর নাস** — যাতে রয়েছে জাদু, হিংসা আর শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জাদুগ্রস্ত হলে মানুষ আরেক জাদুকরের কাছে যেত তা খোলানোর জন্য — অর্থাৎ তারা এক অনিষ্টের চিকিৎসা করত তেমনই আরেক অনিষ্ট দিয়ে, ফলে জাদুকরদের প্রতি আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়ত আর আরও টাকা ঢালত। এই চক্রই গণক আর জাদুকরদের রুজি জুগিয়ে যেত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নবী ﷺ প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে নিজের উপর আশ্রয়ের দুই সূরা পড়তেন, দুই হাতের তালুতে ফুঁ দিতেন আর তা দিয়ে শরীর মুছে নিতেন; আর রোগীদের উপরও সেগুলো পড়তেন (বুখারি ও মুসলিম)। তিনি উকবা ইবনে আমিরকে **প্রতি নামাজের পর** সেগুলো পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন: "আশ্রয়প্রার্থীরা এ দুটির মতো কিছু দিয়ে কখনো আশ্রয় চায়নি।" আর সহিহ হাদিসে এসেছে: "যে ব্যক্তি বিছানায় যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসি পড়ে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক তার উপর থাকে আর সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান তার কাছে ঘেঁষে না।"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন, এই প্রতিকার গোটা সমাজকাঠামোর কী করল। এটি জাদু থেকে রক্ষাকে **সরাসরি প্রত্যেক মানুষের নিজের হাতে** তুলে দিল: ছোট কয়েকটি বাক্য, যা শিশুও মুখস্থ করে ফেলে; কোনো মধ্যস্থ নেই, ফি নেই, আচার-অনুষ্ঠান নেই। এভাবে জাদুকর আর গণকদের কর্তৃত্ব আর ব্যবসা গোড়াতেই ধসে গেল। যে মানুষের উপর কর্তৃত্ব চায়, সে এমন কাজ করে না — বরং তার উল্টোটা করে। আর সূরাটির সবচেয়ে সূক্ষ্ম কথাটি: "**গিঁটে ফুঁ দেওয়া নারীদের**" — এটি হাতে-কলমে জাদুর সবচেয়ে প্রচলিত রূপটিরই বর্ণনা: গিঁট বাঁধা আর তাতে ফুঁ দেওয়া। বাইহাকি তাঁর *দালাইলুন নুবুওয়াহ* গ্রন্থে — এমন এক দুর্বল সনদে যা দলিল হয় না — এগারোটি গিঁটওয়ালা একটি সুতার কথা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তা সহিহ বুখারি ও মুসলিমে প্রমাণিত নয়। সেখানে প্রমাণিত হলো: একটি চিরুনি, চিরুনিতে ওঠা চুল আর খেজুরের পুরুষ মোচার খোল।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য

১৩২ বাবিল — আর ইতিহাসের প্রাচীনতম জাদুর ফলক

আর তারা অনুসরণ করত সেসব বিষয়, যা সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলাইমান কুফরি করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিল; তারা মানুষকে জাদু শেখাত, আর তাও যা বাবিলে দুই ফেরেশতার উপর নাজিল করা হয়েছিল।

সূরা বাকারা — আয়াত 102

খ্রিষ্টপূর্ব হাজার বছরেরও আগে লেখা মন্ত্র ও তাবিজ

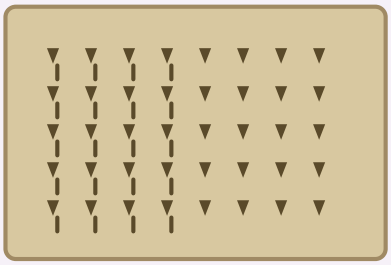

বাবিলের কীলকলিপির মাটির ফলক — জাদুঘরে সংরক্ষিত

ইরাকের মাটি থেকে বেরিয়েছে জাদুর পাঠের গোটা গোটা গ্রন্থাগার

সহজ কথায়

কুরআন জাদুকে একটি নির্দিষ্ট জায়গার সঙ্গে যুক্ত করেছে: **বাবিল**। আর প্রত্নতাত্ত্বিকরা ঠিক সেই মাটি থেকেই বের করেছেন **প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাদু-পাঠের সংগ্রহ**।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কুরআন নাজিলের সময় বাবিল ছিল বিধ্বস্ত আর বিস্মৃত এক ধ্বংসস্তূপ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিত্যক্ত। আর কিউনিফর্ম লিপি তখন কেউ পড়তে পারত না — তা পুরোপুরি মরে গিয়েছিল। কাজেই দুনিয়ার সব রাজধানীর মধ্য থেকে জাদু শেখানোর কাজটিকে **বিশেষভাবে বাবিলের** সঙ্গে যুক্ত করা এমন এক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক নির্দিষ্টকরণ, যা যাচাই করা যায়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কিউনিফর্ম লিপির পাঠোদ্ধার হয় উনিশ শতকে। তখন বেরিয়ে এলো, মেসোপটেমিয়া — যার হৃৎপিণ্ড ছিল বাবিল — ছিল **প্রাচীন বিশ্বের জাদু, মন্ত্র আর তাবিজের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র**। সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কারগুলোর একটি হলো **মাকলু** নামের ফলক-ধারা, জাদু আর তা নষ্ট করা নিয়ে নয়টি পূর্ণ ফলক; আর শুরপু; আর মন্ত্র, জ্যোতিষ ও ভাগ্যগণনার হাজার হাজার ফলক। শুধু আশুরবানিপালের গ্রন্থাগারেই ছিল এমন শত শত ফলক। ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন, গোটা অঞ্চলে এসব বিদ্যা ছড়িয়ে পড়ার উৎস ছিল বাবিলই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ভৌগোলিক নির্দিষ্টকরণটিই যুক্তির মূল বিন্দু। কুরআন কেবল বলেনি "তারা জাদু শিখেছিল" — বরং **যে জন্মভূমি থেকে তা বেরিয়েছিল** তার নামও বলেছে। আর বারো শতাব্দী পরে দেখা গেল, সেই জন্মভূমিই জাদুর পাঠের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রত্নস্থল। এর চেয়েও সূক্ষ্ম হলো **সুলাইমান আলাইহিস সালামের নির্দোষিতা**: "সুলাইমান কুফরি করেননি।" অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনিগুলো — আর পরবর্তী ইহুদি রচনাগুলোও — জাদুকে সুলাইমানের সঙ্গে জুড়ে দিত আর তাঁকে জাদুকরদের সর্দার বানাত। অথচ কুরআন এসে **একজন নবীকে সেই অপবাদ থেকে মুক্ত করল, যা আহলে কিতাব নিজেরাই তাঁর উপর চাপিয়েছিল** — যে তাদের কাছ থেকে ধার করে, সে ঠিক এর উল্টোটাই করে।

সূত্র Abusch – *The Magical Ceremony Maqlû* · Reiner – *Šurpu*

133 ফেরাউনের জাদুকররা — আর ছুটে চলা রশির দৃশ্য

> তিনি বললেন, বরং তোমরাই ছোঁড়ো। তখন হঠাৎ তাদের রশি আর লাঠিগুলো তাদের জাদুর প্রভাবে তাঁর মনে হলো যেন ছুটে চলছে।
>
> **সূরা ত্বা-হা — আয়াত 66**

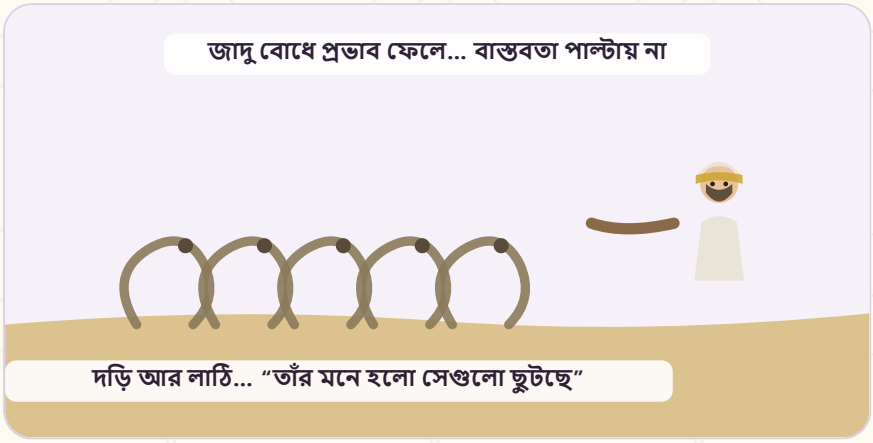

কুরআন জাদুকে বলছে চোখের উপর প্রভাব, নতুন কোনো সৃষ্টি নয়

সহজ কথায়

ফেরাউনের জাদুকররা রশি আর লাঠি নিয়ে এলো, আর তা মানুষের চোখে **ছুটে চলা সাপ** বলে মনে হলো। আর সূক্ষ্ম শব্দটি লক্ষ করুন: "**তাঁর মনে হলো**" — অর্থাৎ সেগুলো বদলে যায়নি; বদলেছিল দর্শকের উপলব্ধি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রাচীন মিসরে জাদু ছিল তার গৌরবের চূড়ায়; তার নিজস্ব পুরোহিত, নিজস্ব পাঠশালা আর লিখিত গ্রন্থ ছিল। আর বিশ্বাস করা হতো, জাদুকর **সত্যিই বস্তুর রূপ পাল্টে দেয়**: লাঠিকে সাপ বানায়, মানুষকে পশু বানায়। এই বিশ্বাস পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সভ্যতাতেই প্রচলিত ছিল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কুরআন এই ধারণা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে আর জাদুর প্রভাবকে তিনটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করেছে: **উপলব্ধি ও ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব** ("তাঁর মনে হলো", "তারা মানুষের চোখে জাদু করল"), **অন্তর ও সম্পর্কের উপর প্রভাব** ("তারা তাদের কাছ থেকে এমন কিছু শিখত, যা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত"), আর **শরীরে কষ্ট দেওয়ার প্রভাব**। কিন্তু **বস্তুর প্রকৃত রূপ পাল্টে দেওয়া** পুরোপুরি অস্বীকৃত। আর মনোবিজ্ঞান আজ পরামর্শ, সম্মোহন আর সমষ্টিগত দৃষ্টিভ্রম নিয়ে যা প্রতিষ্ঠা করেছে, এটি তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

"**উপলব্ধির উপর প্রভাব**" আর "**প্রকৃতি পাল্টে দেওয়া**" — এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্যটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, আর সেকালের সংস্কৃতি তা জানত না। জাদু নিয়ে ইসলামের অবস্থানকে আশপাশের সবকিছু থেকে এটিই আলাদা করে: এটি না এমন পূর্ণ অস্বীকার যা চোখে দেখা ঘটনাকে মিথ্যা বলে, না এমন স্বীকৃতি যে জাদুকর সৃষ্টি করে আর রূপ পাল্টে দেয়। আর মূসার নিজের মুজিজায় পার্থক্যটি লক্ষ করুন: তাঁর লাঠি তাদের বানানো জিনিসগুলো **গিলে ফেলেছিল** — সত্যিকারের গিলে ফেলা। কাজেই কুরআনে মুজিজা আর জাদুর পার্থক্য হলো: **প্রথমটি বাস্তবের বদল, দ্বিতীয়টি চোখের বদল**। আর এ কারণেই জাদুকররাই সবার আগে ঈমান এনেছিল — কারণ নিজেদের বিদ্যার সীমা তারাই সবচেয়ে ভালো জানত।

প্রমাণিত এক ঘটনা

১৩৪ যে শয়তান তিন রাত আবু হুরায়রার কাছে এসেছিল

সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এমন কিছু বাক্য শেখাব যা দিয়ে আল্লাহ আপনার উপকার করবেন ... বিছানায় যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসি পড়বেন ... নবী ﷺ বললেন, সে আপনাকে সত্যই বলেছে, যদিও সে ভীষণ মিথ্যাবাদী। ওটা ছিল একটা শয়তান।

বুখারি বর্ণনা করেছেন — সহিহ

রমজানের সদকার গুদামে তিন রাত ধরে ঘটে যাওয়া এক ঘটনা

সহজ কথায়

নবী ﷺ আবু হুরায়রাকে সদকার খাদ্য পাহারার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাতে একজন এসে তা থেকে চুরি করত, আর তিনি টানা তিন রাত তাকে ধরে ফেললেন। শেষ রাতে লোকটি তাঁকে **আয়াতুল কুরসি** শিখিয়ে দিয়ে বলল, এটি পড়লে কোনো শয়তান তাঁর কাছে ঘেঁষবে না। পরে নবী ﷺ তাঁকে জানালেন, ওটা ছিল একটা শয়তান।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

খাদ্যের গুদাম রাতে পাহারা দেওয়া সাধারণ ব্যাপার। আবু হুরায়রা প্রথমবার তাকে গরিব মানুষ ভেবে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর তা তিনবার ঘটল — আর প্রতিদিন সকালে তিনি নবী ﷺ-কে জানাতেন, আর তিনি বলতেন: “**সে আবার আসবে**” — আর সে আসত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঘটনাটি পূর্ণাঙ্গভাবে **সহিহ বুখারিতে** রয়েছে, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআনে “সূরা বাকারার ফজিলত” অধ্যায়ের অধীনে। এতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত আছে। প্রথমত, নবী ﷺ **প্রতিদিন সকালে আবু হুরায়রাকে বলে দিতেন যে লোকটি সেই রাতে আবার আসবে** — আর সে আসত। দ্বিতীয়ত, চূড়ান্ত রায়টি এসেছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি বাক্যে: “**সে আপনাকে সত্যই বলেছে, যদিও সে ভীষণ মিথ্যাবাদী**” — অর্থাৎ তথ্যটি সঠিক, যদিও বক্তা স্বভাবগতভাবেই মিথ্যাবাদী। তৃতীয়ত, ব্যবহারিক ফলটি দাঁড়াল **প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একটি অস্ত্র**: ঘুমের সময় আয়াতুল কুরসি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এ ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সেই **পদ্ধতি**, যা নবী ﷺ এই জগতের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে শিখিয়েছেন। তিনি ঘটনাটি অস্বীকারও করেননি, ভয়ংকর করেও তোলেননি; বরং **তথ্যটিকে তার নিজের বিচারেই যাচাই করেছেন, বক্তাকে দিয়ে নয়**। আর “সে সত্যই বলেছে, যদিও সে মিথ্যাবাদী” বাক্যটি সংবাদ-সমালোচনার একটি পূর্ণাঙ্গ নীতি। এরপর লক্ষ করুন, ফলাফল দাঁড়াল **কুরআনের একটি আয়াত, যা সবাই মুখস্থ করে** — কোনো আচার নয়, তাবিজ নয়, মানুষের মধ্যস্থতা নয়। গোটা ঘটনাটিই শেষ হয় সাধারণ মানুষকে নিজের রক্ষা নিজের হাতে তুলে দেওয়ায় — আর এই সুতোটিই এ অধ্যায়ের সবকিছু গেঁথে রেখেছে।

কারিন

১৩৫ প্রত্যেক মানুষের একজন কারিন আছে

আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই জিনদের মধ্য থেকে একজন কারিন নিযুক্ত আছে। তাঁরা বললেন, আপনার সঙ্গেও কি, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, আমার সঙ্গেও; তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন, ফলে সে আত্মসমর্পণ করেছে, সে আমাকে কেবল ভালোরই আদেশ দেয়।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন — সহিহ

অন্তর্দ্বন্দ্বের এমন এক ব্যাখ্যা, যা খারাপ চিন্তাকে তার যথাস্থানে বসিয়ে দেয়

সহজ কথায়

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে **জিনদের মধ্য থেকে একজন কারিন** থাকে, যে তাকে মন্দের কুমন্ত্রণা দেয়। এতেই ব্যাখ্যা মেলে সেসব খারাপ চিন্তার, যা হঠাৎ আপনার মনে আসে অথচ আপনি চান না, পছন্দও করেন না।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মানুষ হয় প্রতিটি মনে-আসা চিন্তাকে নিজের বলে ধরে নিয়ে আত্মগ্লানিতে ডুবে যেত, নয়তো নিজের সব কাজ বাইরের কোনো শক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দায় ঝেড়ে ফেলত। চিন্তা আর কাজের মধ্যে পার্থক্য করে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ছিল না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নবী ﷺ এই সত্য সাব্যস্ত করে তারপর **অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্তে তাকে বেঁধে দিয়েছেন**: কারিন **কুমন্ত্রণা দেয়, বাধ্য করে না**; মানুষ **মনে-আসা চিন্তার জন্য পাকড়াও হয় না, যতক্ষণ না সে তা কাজে পরিণত করে** ("আল্লাহ আমার উম্মতের মনে যা আসে তা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা তা করে বা বলে"); আর কুমন্ত্রণার তীব্রতা **ঈমানের আলামত, নষ্ট হয়ে যাওয়ার আলামত নয়** — সাহাবিগণ যখন তাঁদের মনে আসা কুমন্ত্রণার অভিযোগ করলেন, তিনি বললেন: "**এটাই খাঁটি ঈমান**", অর্থাৎ তা নিয়ে আপনাদের এই আঁতকে ওঠাই প্রমাণ করে আপনাদের অন্তর সুস্থ।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই ধারণার মানসিক প্রভাবটি দেখুন, আর আজকের অনেক মানুষের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নিন। যার মনে কোনো বীভৎস চিন্তা আসে আর সে ভাবে তা তার নিজের গভীর সত্তা থেকেই উঠে এসেছে, সে নিজেকে নিয়েই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে — আর ঠিক এটিই ঘটে **ধর্মীয় বিষয়কেন্দ্রিক অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারে**। এই ব্যাখ্যাটি **আপনার উপর যা চাপিয়ে দেওয়া হয়** আর **আপনি নিজে যা বেছে নেন** — এ দুটিকে আলাদা করে দেয়, আর রায় দেয় যে প্রথমটির জন্য আপনাকে হিসাব দিতে হবে না; বরং তার প্রতি আপনার ঘৃণাই আপনার সুস্থতার প্রমাণ। এরপর হাতে-কলমে প্রতিকারও দেয়: আশ্রয় চাওয়া আর থেমে যাওয়া, তর্ক চালিয়ে না যাওয়া। আর আধুনিক মনোচিকিৎসা অনুপ্রবেশকারী চিন্তার ব্যাপারে যা পরামর্শ দেয়, এটি তার খুব কাছাকাছি: তর্ক দিয়ে তার সঙ্গে লড়বেন না, আর নিজেকে তা দিয়ে চিনবেন না।

রক্তের প্রবাহপথ

১৩৬ সে আদম-সন্তানের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে

নিশ্চয়ই শয়তান আদম-সন্তানের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

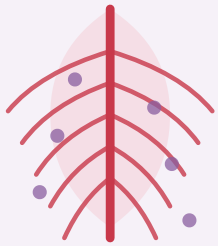

শরীরের কোনো জায়গাই তার নাগালের বাইরে নয়

“রক্তের চলাচল” — সম্ভাব্য সবচেয়ে ব্যাপক উপমা

শরীরে এমন কোনো জীবন্ত কলা নেই যা রক্ত ছাড়া চলে

সহজ কথায়

নবী ﷺ মানুষের ভেতরে শয়তানের নাগালকে বর্ণনা করেছেন **রক্তের চলাচলের মতো** বলে — অর্থাৎ তা আপনার প্রতিটি জায়গায় পৌঁছায়, কোনো অঙ্গই তা থেকে খালি নয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

রক্তসংবহন তখন জানা ছিল না। প্রচলিত ধারণা — গ্যালেনের মত, যা দেড় হাজার বছর ধরে চিকিৎসাশাস্ত্র শাসন করেছে — ছিল এই যে রক্ত যকৃতে তৈরি হয় আর হাত-পায়ে গিয়ে খরচ হয়ে যায়; এমন নয় যে তা **একটি পূর্ণ চক্র ঘুরে** শরীরের প্রতিটি অংশে পৌঁছায় আর আবার ফিরে আসে। এ কথা জানা যায়নি 1628 সালের আগে, উইলিয়াম হার্ভের হাতে; আর তা পূর্ণতা পায় 1661 সালে কৈশিক নালিকা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সংবহনতন্ত্র **শরীরের প্রতিটি জীবন্ত কলাকে** পুষ্টি জোগায় কৈশিক নালিকার এমন এক জালের মধ্য দিয়ে, যার দৈর্ঘ্য আনুমানিক নয় হাজার থেকে উনিশ হাজার কিলোমিটার। আর যেখানে রক্তনালি ঢোকে না — যেমন চোখের কর্নিয়া আর অস্থিসন্ধির তরুণাস্থি — তা বেঁচে থাকে রক্ত থেকে যা চুইয়ে পৌঁছায় তার উপর ভর করে। শরীরের কোনো কিছুই তাকে ছাড়া চলে না। কাজেই পূর্ণ আর সর্বব্যাপী অনুপ্রবেশের উপমা হিসেবে “রক্তের চলাচল” বেছে নেওয়া **গোটা শরীরে সম্ভাব্য সবচেয়ে নিখুঁত উপমা** — আর এর নিখুঁত হওয়ার দিকটি ধরাই পড়ে না, যতক্ষণ না রক্তসংবহন জানা হয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

উপমাটি এলোমেলোভাবে বেছে নেওয়ার নয়। কেবল নৈকট্য বোঝানোই যদি উদ্দেশ্য হতো, তবে বলা হতো “ছায়ার মতো” কিংবা “নিঃশ্বাসের মতো” — দুটিই সেকালের ধারণার বেশি কাছাকাছি। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল **সর্বব্যাপিতা আর প্রতিটি অংশে ভেদ করে পৌঁছানো**, আর শরীরে এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র রক্তেই সত্য হয়ে ওঠে — এমন এক বৈশিষ্ট্য যা দশ শতাব্দী পরের আগে জানা যায়নি। আর নবী ﷺ এর উপর যে ব্যবহারিক শিক্ষা দাঁড় করিয়েছেন তা লক্ষ করুন: তিনি কথাটি বলেছিলেন যখন রাতে সফিয়্যাকে মসজিদ থেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন; দুজন লোক পাশ দিয়ে গিয়ে দ্রুত হাঁটা ধরল, তিনি তাদের থামিয়ে বললেন: “আপনারা ধীরে চলুন; ইনি সফিয়্যা বিনতে হুয়াই।” অর্থাৎ তিনি নীতিটিকে **কুধারণা ওঠার আগেই নিজের থেকে তা সরিয়ে দেওয়ার** কারণ বানিয়েছেন — এটি ভয় দেখানোর নয়, স্বচ্ছতার শিক্ষা।

সূত্র Harvey – *De Motu Cordis*, 1628 · Malpighi – the capillaries, 1661

137 নজর সত্য — আর সাহাবিদের সামনেই ঘটে যাওয়া এক ঘটনা

নজর সত্য; কোনো কিছু যদি তাকদিরকে ছাড়িয়ে যেতে পারত, তবে নজরই তাকে ছাড়িয়ে যেত। আর আপনাদের কাছে গোসলের অনুরোধ করা হলে গোসল করুন।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন — সহিহ

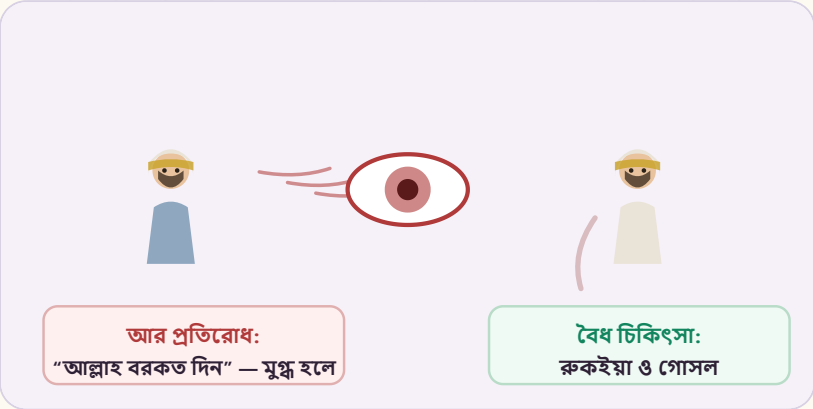

সাহল ইবনে হুনাইফ ও আমির ইবনে রাবিআর ঘটনা — বর্ণনা করেছেন মালিক, আহমাদ ও নাসায়ি

সহজ কথায়

"নজর সত্য" — অর্থাৎ মুগ্ধতা বা হিংসার দৃষ্টি সত্যিই ক্ষতি করতে পারে। আর বিষয়টি প্রতিকারহীন রাখা হয়নি: **রুকইয়া আর গোসল**; আর প্রতিরোধ এভাবে যে, কোনো কিছু ভালো লাগলে মুগ্ধ ব্যক্তি যেন বরকতের দোয়া করে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরব আর অন্যদের মধ্যে নজরকে ভয় করা হতো, আর তারা তা ঠেকাত তাবিজ, পুঁতি, কবচ, হাড় ঝোলানো আর পশুর চোখ দিয়ে। অর্থাৎ তারা এক বিশ্বাসের মোকাবিলা করত আরেক কুসংস্কার দিয়ে, আর তার জন্য দামও দিত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বিখ্যাত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন মালিক তাঁর মুয়াত্তায়, আর আহমাদ ও নাসায়ি: **সাহল ইবনে হুনাইফ** গোসল করছিলেন, **আমির ইবনে রাবিআ** তাঁকে দেখে বললেন: "আজকের মতো এমন কিছু আমি দেখিনি, আড়ালে রাখা কুমারীর গায়ের চামড়াও এমন নয়" — আর সাহল সেখানেই লুটিয়ে পড়লেন। নবী ﷺ-কে জানানো হলে তিনি বললেন: "**আপনাদের কেউ কেন তার ভাইকে হত্যা করে? সে বরকতের দোয়া করল না কেন?**" এরপর তিনি আমিরকে ওজু করার আদেশ দিলেন আর সেই পানি সাহলের উপর ঢেলে দেওয়া হলো — সাহল সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আর এ সবই ঘটেছিল **সফরে একদল সাহাবির চোখের সামনে**।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এ ঘটনার তিনটি দিকে থামা দরকার। প্রথম: **যার নজর লেগেছিল তিনি হিংসুক বা বিদ্বেষী ছিলেন না**, বরং ছিলেন মুগ্ধ ও স্নেহশীল — আর এতেই ভেঙে যায় সেই প্রচলিত ধারণা যে নজর কেবল শত্রুর কাছ থেকেই লাগে। দ্বিতীয়: প্রতিকারটি এসেছিল **যার নজর লেগেছে তার দিক থেকে, আক্রান্তের দিক থেকে নয়** — নজরদাতা গোসল করেন আর সেই পানি আক্রান্তের উপর ঢালা হয়। এটি সেসব আচারের ঠিক উল্টো, যা আক্রান্তের গায়ে তাবিজ বাঁধত। তৃতীয় — আর এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ —: নবী ﷺ **তাবিজকে কঠোরভাবে হারাম করেছেন** ("যে তাবিজ ঝোলাল, সে শিরক করল") আর তার বদলে দিয়েছেন সহজ, বিনামূল্যের, হাতে-কলমে একটি প্রতিকার। এভাবে তিনি একই সঙ্গে ঘটনাটি সাব্যস্তও করেছেন আর তার সঙ্গে জড়ানো কুসংস্কার বাতিলও করেছেন — গোটা অধ্যায়জুড়ে এটিই ধরন।

প্রমাণিত অধীনতা

১৩৪ সুলাইমান ও তাঁর অধীন জিনেরা

আর শয়তানদের মধ্যে এমন কিছু ছিল যারা তাঁর জন্য ডুব দিত এবং এ ছাড়া অন্য কাজও করত; আর আমিই ছিলাম তাদের রক্ষক

সূরা আম্বিয়া — আয়াত ৪২

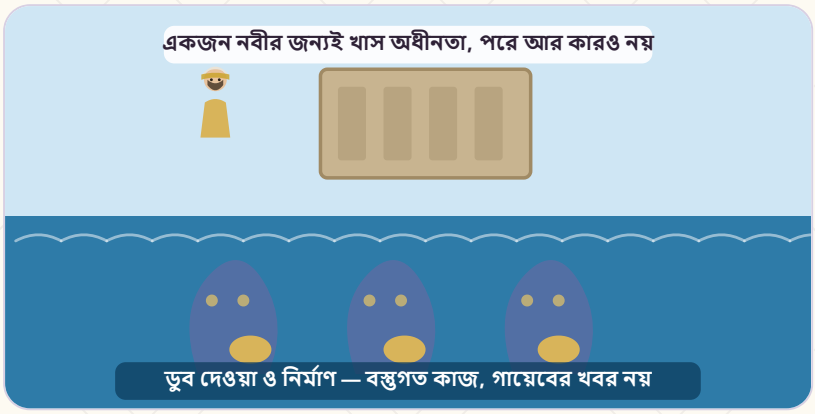

নির্দিষ্ট ও সীমিত কাজ: ডুব দেওয়া, মুক্তা তোলা এবং নির্মাণ

সহজ কথায়

আল্লাহ সুলাইমান আলাইহিস সালামের অধীন করে দিয়েছিলেন জিনের এক দল, যারা তাঁর জন্য কাজ করত: **সমুদ্রে ডুব দিত এবং ইমারত গড়ত**। এটি ছিল কেবল তাঁরই জন্য খাস মুজিযা; তিনি রবের কাছে দোয়া করেছিলেন, যেন তাঁর পরে আর কারও জন্য এটি না হয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সেই অঞ্চলের প্রচলিত উপকথাগুলো সুলাইমানের দিকে জাদু এবং কালাম ও তাবিজের সাহায্যে রুহের উপর কর্তৃত্বের নিসবত করত — যা জাদুকরেরা বংশপরম্পরায় পেত। তাঁর নামে রচিত বইপত্রও এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে চলত — সবই বানানো ও মিথ্যা।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কুরআন বিষয়টিকে কঠোর শর্তে বেঁধে দিয়েছে। প্রথমত, এই অধীনতা ছিল **কেবল আল্লাহর অনুমতিতে**, কোনো জাদুবিদ্যায় নয়: "আর জিনদের মধ্যে কেউ কেউ **তার রবের অনুমতিক্রমে** তাঁর সামনে কাজ করত"। দ্বিতীয়ত, কাজগুলো ছিল **বস্তুগত ও সীমিত**: ডুব দেওয়া, নির্মাণ ও বহন — গায়েবের কোনো জ্ঞান নয়, তাকদিরে কোনো হস্তক্ষেপ নয়। তৃতীয়ত — এবং এটিই সবচেয়ে স্পষ্ট — কুরআন এই ঘটনার ভেতরেই **জিনদের গায়েব না-জানার কথা** ঘোষণা করেছে: সুলাইমান লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় ইন্তিকাল করার পরও তারা কাজ করে যাচ্ছিল, তাঁর মৃত্যুর খবরই তারা জানত না — "অতঃপর যখন তিনি পড়ে গেলেন, তখন জিনদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে তারা গায়েব জানলে এই লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে পড়ে থাকত না"।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই বিস্ময়কর বৈপরীত্যটি লক্ষ করুন: যে কাহিনি জিন বশ করার সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন হতে পারত, সেটিকেই বানিয়ে দেওয়া হলো **তাদের গায়েব জানতে না পারার চূড়ান্ত প্রমাণ**। যে জিনেরা ডুব দিত আর ইমারত গড়ত, তারা নিজেদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির মৃত্যুর খবরই জানল না! গণকবৃত্তিকে মহিমান্বিত করা এক সমাজে গ্রন্থটি মানুষের রচনা হলে সে নিজের হাতে, একই আয়াতে, নিজের কিংবদন্তি ভেঙে দিত না। তারপর সুলাইমান দোয়া করলেন: "**আর আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যা আমার পরে আর কারও জন্য শোভা পাবে না**" — এতে তাঁর পরে জিন বশ করার দাবিদার প্রত্যেকের সামনে দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। জাদুকরেরা যে কাহিনি দলিল হিসেবে পেশ করে, সেটিই আসলে তাদের দাবির সবচেয়ে বড় খণ্ডন।

আড়ি পেতে শোনা

১৩৯ নবুয়তের পর গণকবৃত্তি থেমে গেল কেন?

আর আমরা আকাশ স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম তা কঠোর প্রহরী ও জ্বলন্ত উল্কায় ভরা। আর আমরা তো সেখানে শোনার জন্য নানা ঘাঁটিতে বসতাম; কিন্তু এখন কেউ কান পাতলে সে তার জন্য ওঁত পেতে থাকা এক জ্বলন্ত উল্কা পাবে

সূরা আল-জিন — আয়াত ৪-৯

লক্ষণীয় এক সামাজিক ঘটনা: নবুয়তের সূচনায় গণকবৃত্তির পতন

সহজ কথায়

গণকেরা এমন কিছু খবর দিত যা কখনো কখনো সত্য হয়ে যেত, কারণ শয়তানেরা আকাশের সংবাদ থেকে কিছু শুনে এসে তাদের কানে ঢেলে দিত। নবী ﷺ প্রেরিত হওয়ার পর **তাদের সেই সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হলো**, ফলে উৎসই কেটে গেল এবং তাদের পেশা বাতিল হয়ে গেল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

গণকবৃত্তি ছিল আরব উপদ্বীপের একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক প্রতিষ্ঠান: গণকের ছিল মর্যাদা, অর্থ ও কর্তৃত্ব; বিবাদ মীমাংসায় তার কাছে যাওয়া হতো, গোপন বিষয় তাকে জিজ্ঞেস করা হতো। সবচেয়ে প্রসিদ্ধদের মধ্যে ছিল সাতিহ, শিক্ক ও সাওয়াদ। মাঝেমধ্যে তাদের কথা মিলে যাওয়াই তাদের মর্যাদা টিকিয়ে রাখত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঐতিহাসিক সূত্র ও সিরাতগ্রন্থগুলোতে আছে, নবী ﷺ-এর নবুয়তের সময় গণকেরা নিজেরাই **খবর কেটে যাওয়ার অভিযোগ করেছিল**, এবং তাদের অনেকে নিজের গোত্রকে তা জানিয়েছিল — বরং কারও কারও ইসলাম গ্রহণের কারণই ছিল এটি। ঐতিহাসিকভাবে লক্ষণীয়, সামাজিক জীবনের একটি স্তম্ভ হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের পর **পুরোনো অর্থে গণকবৃত্তি উপদ্বীপ থেকে প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়**। আর এর প্রক্রিয়াটি বুখারি ও মুসলিম উভয়েই বর্ণিত: "সে তা নিচের জনের কাছে ফেলে দেয়... তারপর তারা এর সঙ্গে একশত মিথ্যা মিশিয়ে দেয়"।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

নবী ﷺ কেবল নিষেধ করেই থেমে যাননি, বরং **ঘটনার রহস্য এমনভাবে খুলে দিয়েছেন, যা একে ভেতর থেকেই বাতিল করে দেয়**। তাঁকে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: "ওরা কিছুই নয়"। তারা বলল: কিন্তু ওরা তো কখনো কখনো আমাদের এমন কথা বলে, যা সত্য হয়। তিনি ﷺ বললেন: "**সত্যের সেই একটি কথা জিন ছোঁ মেরে নিয়ে তার সঙ্গীর কানে ঢেলে দেয়, তারপর তারা এর সঙ্গে একশত মিথ্যা মিশিয়ে দেয়**"। আজ মনোবিজ্ঞান যাকে **"কনফার্মেশন বায়াস" তথা নিশ্চয়ন-পক্ষপাত** বলে, এ তারই অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা: মানুষ একটিমাত্র মিলে-যাওয়া কথা মনে রাখে আর একশত ব্যর্থতা ভুলে যায়। তিনি গণকবৃত্তিকে নিছক অস্বীকার করে নয়, বরং এর ভিত্তিতে থাকা সাংখ্যিক কৌশল উন্মোচন করে বাতিল করেছেন — আর ঠিক এই যুক্তিই আজ বিজ্ঞান জ্যোতিষ ও ভাগ্যগণনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

140 হে সারিয়া... পাহাড়!

উমর মিম্বরে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন: হে সারিয়া, পাহাড়! ... দূত বলল: আমরা উমরের আওয়াজ শুনতে পেলাম, তাই পাহাড়ের দিকে পিঠ ঠেকালাম, আর আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করলেন

বাইহাকি, ইবনে আসাকির ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন — একদল আলিম হাসান বলেছেন

আওয়াজ পৌঁছাল... ফিরে এসে সেনারা তা সত্য বলল

তাবিয়িদের বর্ণিত এক কারামত, আলিমগণ যা নিজেদের গ্রন্থে বহন করে এনেছেন

সহজ কথায়

উমর ইবনুল খাত্তাব মদিনায় জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ চিৎকার করে বললেন: **"হে সারিয়া... পাহাড়!"** সারিয়া তখন শত শত মাইল দূরে এক বাহিনীর সেনাপতি। বাহিনী ফিরে এসে বলল: আমরা উমরের আওয়াজ শুনেছি, তাই পাহাড়ের আশ্রয় নিয়েছি এবং জয়ী হয়েছি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মদিনা আর রণাঙ্গনের মধ্যে উটে চড়া দূত ছাড়া যোগাযোগের কোনো উপায় ছিল না, তাতে লাগত কয়েক সপ্তাহ। খুতবা হচ্ছিল মদিনার সব মানুষের সামনে। তারা ডাকটি শুনেছিল, অবাক হয়েছিল, কিন্তু তখন এর অর্থ বোঝেনি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

খবরটি বাইহাকি তাঁর "দালাইলুন নুবুওয়াহ"-এ, ইবনে আসাকির "তারিখু দিমাশক"-এ, আর আবু নুআইম, ইবনুল আসির প্রমুখ একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সূত্রগুলোর সমষ্টির ভিত্তিতে একদল আলিম একে হাসান বলেছেন; ইবনে হাজার, ইবনে কাসির ও ইবনে তাইমিয়া একে উল্লেখ করেছেন। বর্ণিত **সাহাবিদের কারামতের** মধ্যে এটি অন্যতম প্রসিদ্ধ। এর সমতুল্য ঘটনাও প্রমাণিত: **আলা ইবনুল হাদরামি** ও তাঁর বাহিনী পানির উপর দিয়ে উপসাগর পেরিয়ে দারিনে পৌঁছেছিলেন; **খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ** বিষ পান করেছিলেন, তা তাঁর ক্ষতি করেনি; আর **সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস** নবী ﷺ-এর দোয়ার বরকতে দোয়া-কবুল হওয়া ব্যক্তি ছিলেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

মুজিযা ও কারামতের পার্থক্য এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। মুজিযা ঘটে নবীর হাতে, চ্যালেঞ্জ হিসেবে এবং নবুয়তের প্রমাণ হিসেবে; আর কারামত ঘটে নেককারের হাতে, **কোনো চ্যালেঞ্জ ছাড়া, কোনো দাবি ছাড়া**। এ কারণেই কারামত চাওয়া হয় না, তা নিয়ে গর্বও করা হয় না, আর যাঁর হাতে তা ঘটে, তাঁর জন্য এর উপর কোনো দাবি দাঁড় করানো বৈধ নয়। যে একে চায় এবং একে উপার্জনের পথ বানায়, সে-ই এ থেকে সবচেয়ে দূরে। আজ "আধ্যাত্মিক শক্তি", "ফতহ" ও "কাশফ" নামে যা কেনাবেচা হয়, ইসলামকে তা থেকে আলাদা করে ঠিক এই মানদণ্ডটিই। উমরকে তাঁর সেই ডাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, কোনো ব্যাখ্যা দেননি — কারামতের অধিকারীদের অবস্থান এটিই।

অপরিহার্য পার্থক্য

141 সব রোগ জিনের আছর নয়

হে আল্লাহর বান্দাগণ, চিকিৎসা গ্রহণ করুন; কারণ আল্লাহ এমন কোনো রোগ রাখেননি যার ওষুধ রাখেননি — কেবল একটি রোগ ছাড়া: বার্ধক্য

আবু দাউদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন — সহিহ

প্রথমে: চিকিৎসকের কাছে যান	তারপর শরিয়তসম্মত রুকইয়াহ
• দেহগত মৃগীরোগ	• কুরআন পড়া হবে, চড়া ফি ছাড়া
• ভিটামিনের ঘাটতি	• কোনো আচার নয়, ধূপও নয়
• গ্রন্থির ব্যাধি	• নাম-মায়ের নাম জিজ্ঞাসা নয়
• পরিচিত মানসিক রোগ	• নারীর সঙ্গে নির্জনতা নয়
• ঘুমের অভাব ও ক্লান্তি	• আর রোগী নিজেই পড়বে

এই নিয়ম যে ভাঙে, সে ভণ্ড — রুকইয়াকারী নয়

সঠিক ক্রম: আগে চিকিৎসা, তারপর শর্তসাপেক্ষে রুকইয়াহ

সহজ কথায়

ইসলাম জিনের আছর ও জাদুকে সত্য বলে মেনেছে, **কিন্তু প্রতিটি রোগকে সেগুলোর ফল বানায়নি**। বরং আগে চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছে, আর রুকইয়াহকে বানিয়েছে এমন কুরআন পাঠ, যা রোগী নিজেই নিজের উপর পড়বে — কোনো মধ্যস্থ ছাড়া, কোনো ফি ছাড়া, কোনো আচার ছাড়া।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ইসলামের আগে জাতিগুলো অধিকাংশ রোগকে রুহ ও শয়তানের দিকে ফেরাত, ফলে রোগীর চিকিৎসা হতো নানা আচার, জিনের উদ্দেশে বলি আর তাবিজ দিয়ে। ইউরোপে এ ধারা চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, এমনকি সতেরো শতকে জাদুর অভিযোগে নারীদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে। মানসিক রোগীদের সঙ্গেও আচরণ করা হতো আছরগ্রস্তদের মতো।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নবী ﷺ স্পষ্ট ভাষায় চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: "**প্রত্যেক রোগের ওষুধ আছে**"; তিনি মধু, হিজামা ও কালোজিরা ব্যবহার করেছেন এবং সাহাবিদের জন্য নির্দিষ্ট ওষুধ বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "আরোগ্য তিনটিতে: মধুর শরবত, হিজামার ছুরি, আর আগুনের দাগ"। উবাই ইবনে কাবের কাছে তিনি **একজন চিকিৎসক** পাঠিয়েছিলেন, যিনি তাঁর একটি শিরা কেটে তারপর তাতে দাগ দিয়েছিলেন (মুসলিম)। আর রুকইয়াহর ব্যাপারে আলিমদের শর্ত তিনটি: তা হবে আল্লাহর কালাম বা তাঁর নামসমূহ দিয়ে; হবে আরবি ভাষায়, নয়তো এমন ভাষায় যার অর্থ জানা যায়; আর বিশ্বাস থাকতে হবে যে এটি উপায়মাত্র, নিজে থেকে কার্যকর কিছু নয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই মানদণ্ডই মানুষকে দুটি বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। প্রথমটি: দৈহিক রোগকে আছর মনে করে **চিকিৎসা ছেড়ে দেওয়া** — এতে বহু মানুষ মারা গেছে। দ্বিতীয়টি: **ভণ্ডদের হাতে পড়া**, যারা ভয়কে কাজে লাগিয়ে সম্পদ ও সম্ভ্রম লুটে নেয়। এ কারণেই নবী ﷺ এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর হয়েছেন: "**যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ রাত তার নামাজ কবুল হবে না**", এবং "**যে গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মদের উপর যা নাজিল হয়েছে তা অস্বীকার করল**"। বাস্তবতা প্রমাণের জন্য যে দরজা খোলা হয়েছিল, **শোষণের সামনে তা শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে**। আর যে রাকি আপনার নাম ও আপনার মায়ের নাম জানতে চায়, কিংবা বলির পশু, ব্যবহৃত জিনিস বা মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে — নবী ﷺ হুবহু তার সম্পর্কেই সতর্ক করেছেন।

সূত্র American Psychiatric Association – *DSM-5*

ইতিহাসের সাক্ষ্য

১৪২ প্রতিটি জাতিই এই জগৎকে চিনেছে

যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন: হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা তো মানুষের অনেককে বশে এনেছ। মানুষের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে: হে আমাদের রব, আমরা একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি

সূরা আল-আনআম — আয়াত 128

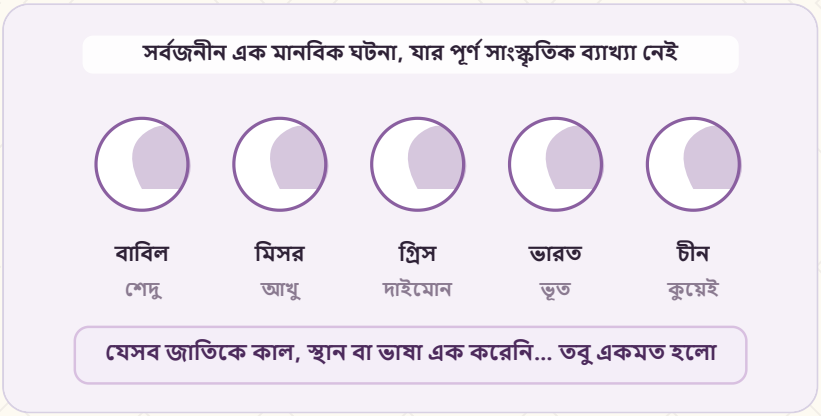

চোখে অদৃশ্য এক বুদ্ধিমান জগতের বিশ্বাস পরিচিত প্রতিটি সভ্যতাতেই আছে

সহজ কথায়

ইতিহাসের প্রতিটি জাতি — ব্যাবিলন, মিসর, গ্রিস, ভারত, চীন এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার জনগোষ্ঠী — **বুদ্ধিসম্পন্ন অদৃশ্য সৃষ্টির** অস্তিত্ব জেনেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে তাদের ডেকেছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এই জনগোষ্ঠীগুলো ছিল পরস্পর থেকে বহু দূরে, একে অন্যকে চিনত না; তাদের ছিল না অভিন্ন ভাষা, ছিল না বাণিজ্য। তবু তাদের ধারণা মিলে গেছে বিস্ময়করভাবে: বুদ্ধিমান সত্তা, যারা বিরান ও প্রান্তরে থাকে, ক্ষতিও করে উপকারও করে, বলি দিয়ে যাদের তুষ্ট করা হয়, আর যাদের মধ্যে ভালোও আছে মন্দও আছে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নৃতত্ত্ববিদেরা একে বলেন **"সাংস্কৃতিক সর্বজনীনতা"** (Cultural Universal): যা ব্যতিক্রমহীনভাবে পরিচিত সব সমাজেই দেখা যায়। বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মিক সত্তায় বিশ্বাস এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণগুলোর একটি, আর জর্জ মারডক তাঁর বিখ্যাত তালিকায় এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। নামগুলো: ব্যাবিলনে "শেদু", মিসরে "আখু", গ্রিকদের কাছে "ডাইমন", ভারতে "ভূত", আর আরবদের কাছে "জিন"।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটিকে এখানে নিজে থেকেই চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হচ্ছে না — কেবল মতৈক্য দিয়ে সত্যতা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এটি **প্রচলিত ব্যাখ্যাটিকে খণ্ডন করে**: বলা হয়, জিন একটি আরব কুসংস্কার, কুরআন নিজের পরিবেশ থেকে তা তুলে নিয়েছে। অথচ এই বিশ্বাস আরবদের চেয়ে হাজার হাজার বছরের পুরোনো এবং তাদের সীমা ছাড়িয়ে গোটা মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত। আরও সূক্ষ্মভাবে বললে, কুরআন **প্রচলিত ধারণাটি নকল করেনি, বরং সংশোধন করেছে**: সব জাতিই তাদের পূজা করত ও বলি দিত — কুরআন তা হারাম করেছে এবং শিরক নাম দিয়েছে; তারা তাদের দিকে গায়েবের জ্ঞান নিসবত করত — কুরআন তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে; তারা তাদের বানিয়েছিল আধা-দেবতা — কুরআন তাদের বানিয়েছে **দায়িত্বপ্রাপ্ত এক সৃষ্টি, যাদের হিসাব হবে যেমন আমাদের হবে**। অস্তিত্বের মূলে মিল, বিধানে পূর্ণ অমিল — এ তো সংশোধনকারীর কাজ, নকলকারীর নয়।

সূত্র Murdock (1945) – the common denominator of cultures · Donald E. Brown – *Human Universals*, 1991

143 পাঁচ বিষয় জানেন কেবল আল্লাহ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান; তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জানেন গর্ভাশয়ে যা আছে। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, আর কেউ জানে না কোন ভূমিতে সে মারা যাবে

সূরা লুকমান — আয়াত 34

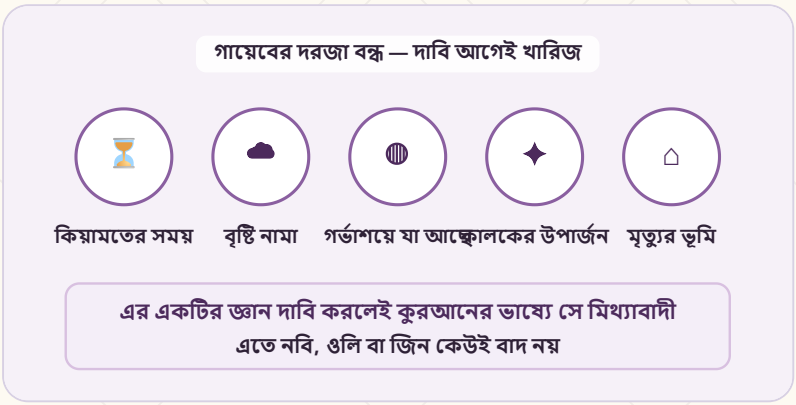

চূড়ান্ত এক সীমা, যা প্রত্যেক দাবিদারের পথ কেটে দেয়

সহজ কথায়

এই অধ্যায়ে যা কিছু গেল, তার পর কুরআন দরজাটি শক্ত করে বন্ধ করে দেয়: **পাঁচটি বিষয় আছে, যা একমাত্র আল্লাহই জানেন**। সুতরাং যে এগুলোর কোনো একটির জ্ঞান দাবি করে — সে যেই হোক — সে মিথ্যাবাদী।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

গণকবৃত্তি, ভবিষ্যদ্বাণী, জ্যোতিষ ও রাশিফল ছিল প্রতিটি সভ্যতার রমরমা পেশা। গণককে গায়েব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো, সে উত্তর দিত; কখনো মিলে যেত, তাতে তার মর্যাদা বাড়ত। এগুলো ছিল বিরাট উপার্জন ও প্রভাবের দরজা।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

এই পাঁচটি আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে, আর নবী ﷺ ইবনে উমরের হাদিসে (বুখারি) এগুলোর নাম দিয়েছেন "**গায়েবের পাঁচ চাবি**"; জিবরিলের হাদিসেও "পাঁচটি বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না" বলার সময় তিনি এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করেছেন। লক্ষ করুন, এগুলো ধোঁয়াটে অস্পষ্ট কোনো বিষয় নয়, বরং **যাচাইযোগ্য**: ইতিহাসে কেউ কিয়ামতের দিন নির্ধারণ করতে পারেনি, কেউ নিশ্চিতভাবে বৃষ্টি নামার কথা বলতে পারেনি (আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্ভাবনা দেয়, নিশ্চয়তা নয়), আর গর্ভাশয়ে যা আছে তার পরিণতি, রিজিক, আয়ু ও আমল **পুরোপুরি** কেউ জানতে পারেনি — আর আলট্রাসাউন্ডে লিঙ্গ জানা তো গঠিত হওয়ার পর যা প্রকাশ পেয়েছে তা দেখা, তার আগের গায়েব জানা নয়।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই সীমাটিই গোটা অধ্যায়ের **নিরাপত্তা-কপাট**। কারণ আগে যা কিছু গেল — জিন, জাদু, বদনজর ও কারামত সাব্যস্ত করা — তা প্রতারণা ও শোষণের বিশাল দরজা খুলে দিতে পারত। তাই এই আয়াত এল প্রত্যেক দাবিদারের পথ আগেভাগেই কেটে দিতে: **যে আপনাকে আপনার আগামীকালের খবর দেয়, সে মিথ্যাবাদী** — অন্য সব ব্যাপারে সে যতই সত্যবাদী মনে হোক। নবী ﷺ নিজেই আদিষ্ট হয়েছিলেন নিজের সম্পর্কে তা ঘোষণা করতে: "**বলুন, আল্লাহ যা চান তা ছাড়া নিজের কোনো উপকার বা ক্ষতির মালিক আমি নই; আমি যদি গায়েব জানতাম, তবে প্রচুর কল্যাণ জমা করে নিতাম**"। অর্থাৎ যিনি এই দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তাঁর যুগের গণকেরা যা দাবি করত, তিনি **সবার আগে নিজের থেকেই তা অস্বীকার করেছেন**। ক্ষমতালোভী কোনো দাবিদার এমন করে না।

144 আপনার দৈনন্দিন দুর্গ... যে কথার কোনো দাম নেই

যে সন্ধ্যায় বলে: আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে — সে রাতে কিছুই তার ক্ষতি করবে না

মুসলিম বর্ণনা করেছেন — সহিহ

সহিহ হাদিসে প্রমাণিত চারটি জিকির, যা বাকি সবকিছুর প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়

সহজ কথায়

এই জগতের মুখোমুখি মানুষকে নিরস্ত্র ছেড়ে দেওয়া হয়নি। নবী ﷺ তাকে দিয়েছেন **ছোট ছোট জিকির, যা শিশুও মুখস্থ করতে পারে** — যা সে নিজেই বলবে, কোনো মধ্যস্থ ছাড়া, অর্থ ছাড়া, আচার ছাড়া।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জিন ও হিংসা থেকে সুরক্ষার জন্য দরকার হতো **একজন মধ্যস্থের**: গণক, জাদুকর কিংবা তাবিজ-বিক্রেতা। মানুষ এর জন্য অর্থ ও বলি দিত, আর সন্তানদের ও পশুদের গলায় নানা জিনিস ঝুলিয়ে সেগুলোর সঙ্গে হৃদয় বেঁধে রাখত। এ ছিল এমন এক ব্যবস্থা, যা পরনির্ভরতা ও ভয় উৎপাদন করত আর কর্তাদের মুনাফা জোগাত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

সহিহ হাদিসে প্রমাণিত জিকির অনেক; সবচেয়ে প্রসিদ্ধগুলো: ঘুমানোর সময় **আয়াতুল কুরসি** — "আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক আপনার উপর থাকবে, আর কোনো শয়তান আপনার কাছে আসবে না"; সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার **সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস** — "এগুলোই আপনার জন্য সবকিছুর বিরুদ্ধে যথেষ্ট"; **"আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে"** — "সে রাতে কোনো কিছুই তার ক্ষতি করবে না"; **ঘরে প্রবেশের ও খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা** — "তোমাদের জন্য রাতযাপনও নেই, রাতের খাবারও নেই"; আর ঘরে **সূরা বাকারা** পড়া — "এতে শয়তান ঢোকে না"।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই দ্বীন যে কাঠামোটি দাঁড় করিয়েছে, তা একবার দেখুন এবং আগে যা ছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে নিন। এটি সুরক্ষাকে **মধ্যস্থের একচেটিয়া দখল** থেকে সরিয়ে **প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ** বানিয়ে দিয়েছে। মুসলিমের কোনো রাকি লাগে না, গণক লাগে না, তাবিজ লাগে না, ফি লাগে না — কেবল কিছু কথা, যা সে মুখস্থ করে নিজেই বলে; আর তা গরিবের নাগালে যতটা, ধনীর নাগালেও ততটাই। এতে ভণ্ডামির অর্থনীতি গোড়া থেকেই ভেঙে পড়ে, আর তার জায়গায় বিকল্প কোনো কর্তৃত্বও বসানো হয় না। তারপর লক্ষ করুন, এই জিকিরগুলোর সবই **আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা, জিনের নয়, কোনো নামেরও নয়** — অর্থাৎ যে মুহূর্তে এগুলো রক্ষা করছে, সেই মুহূর্তেই তাওহিদ শেখাচ্ছে। শরিয়তসম্মত রুকইয়াহ আর বাকি সবকিছুর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি এটিই।

অধ্যায়ের সারকথা

145 এ বিষয়ে ভারসাম্য

> মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক জিনের কিছু লোকের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের পাপের বোঝা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল
>
> **সূরা আল-জিন — আয়াত 6**

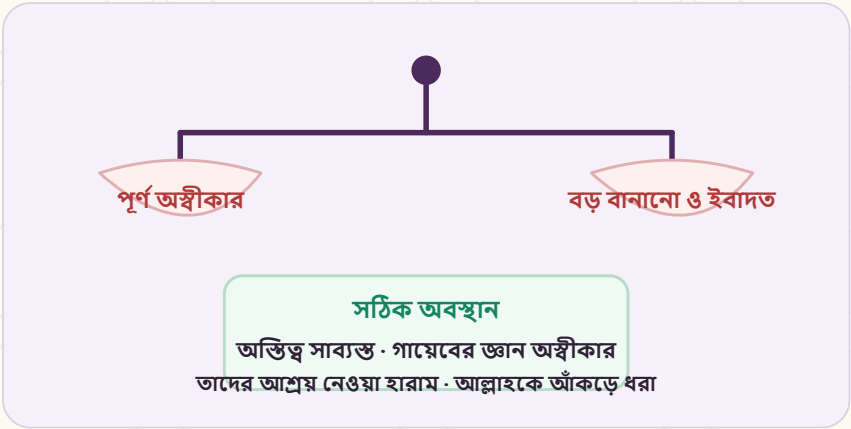

এক দিকে ওইকে মিথ্যা বলা অস্বীকার, অন্য দিকে শিরকে পৌঁছে দেওয়া বাড়াবাড়ি

সহজ কথায়

গায়েবের জগৎ বাস্তব, তবে তার সঙ্গে আচরণের **সূক্ষ্ম ভারসাম্য** আছে: আমরা একে অস্বীকার করি না, করলে আল্লাহর দেওয়া খবরকেই মিথ্যা বলা হয়; আবার একে বড়ও বানাই না, বানালে শিরক, ভয় ও প্রতারণায় পড়তে হয়।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রাচীনকালে মানুষ এক প্রান্তে পড়েছিল: বড় বানানো, আশ্রয় চাওয়া, বলি দেওয়া আর গণকবৃত্তি। আর আজ বহু মানুষ পড়েছে অন্য প্রান্তে: চোখে যা দেখা যায় না তার সবই অস্বীকার। দুই প্রান্তই ভুল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কুরআন ও সুন্নাহ যে অবস্থান নির্ধারণ করেছে, তাতে পাঁচটি মূলনীতি একসঙ্গে আছে, একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করা যায় না: **অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা** — এ তো গায়েবে ইমানেরই অংশ; **তাদের থেকে গায়েবের জ্ঞান অস্বীকার করা** — তাই কোনো গণকবৃত্তি নেই, জ্যোতিষও নেই; **তাদের কাছে আশ্রয় চাওয়া হারাম করা** এবং একে শিরক গণ্য করা; **চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া** এবং অনুমানের আগে ওষুধকে স্থান দেওয়া; **আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে সুরক্ষা** — কোনো মধ্যস্থ ছাড়া, কোনো ফি ছাড়া, কোনো আচার ছাড়া।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

সব মিলিয়ে এই পুরো ব্যবস্থাটিই দলিল। এই দ্বীন যদি সেই পরিবেশের কোনো মানুষের বানানো হতো, তবে তার জন্য সবচেয়ে সহজ — এবং সবচেয়ে লাভজনক — কাজ হতো প্রচলিত গণকবৃত্তির ঢেউয়ে চড়ে বসা: নিজের জন্য গায়েবের জ্ঞান দাবি করা, অনুসারীদের জন্য উপার্জনের একটি মধ্যস্থ বানিয়ে দেওয়া, আর অজানার ভয়ের উপর একটি আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব গড়ে তোলা। বহু জাতির ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঠিক এটিই করেছে। কিন্তু যিনি এই দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তিনি করেছেন হুবহু উল্টোটা: **নিজের থেকে গায়েবের জ্ঞান অস্বীকার করেছেন**, **গণকবৃত্তি ও তাবিজ বাতিল করেছেন**, **প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে বিনামূল্যে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন**, আর **রাকির আগে চিকিৎসকের নির্দেশ দিয়েছেন**। যে এমন করে, সে নিজের জন্য কর্তৃত্ব গড়ে না — সে তো তার উপর অর্পিত একটি বার্তা পৌঁছে দেয়।